Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No.125-129
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ওরা থাকে ওধারে : প্রসঙ্গ মানিকের পদ্মানদীর মাঝি

ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্ত্তী)
সহকারী অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In fact the reasons behind the classification of man are not only race religion or caste. The most significant issue is pecuniary condition. Financially poor people are generally treated as lower class human being. They are not allowed right to take part in main stream of the society. They are marginal people. It is found that such people often play the role in Bengali literature. The great novelist Manik Bandyopadhyay created "Padmanadir mahji". The life and struggle of fishermen are endorsed there. Manik wrote the pathetic lifestyle of these kinds of people through Kuber etc. The conflict between feudal system and capitalism has taken a great part in this novel. Due to poverty the subaltern people are bound to accept capitalism, and so they become vagabond and cadaverous. Through this essay I have tried to explain the actual feature of those fishermen which was narrated by the novelist.

মানুষে মানুষে বিভাজনের কারণ হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণের পাশাপাশি অর্থও অন্যতম। জীবিকা বা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষের সামাজিক অবস্থানও ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার এই জীবিকার সঙ্গেই জড়িত আর্থিক বিষয়টি; যা মানুষকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এভাবে ত্রিধাবিভক্ত করেছে। আর্থিক অসঙ্গতি মানুষকে অনেক সময় সমাজে কোনঠাসাও করে তোলে। তাঁরা হয়ে পড়ে সমাজের প্রান্তিকজন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলভোগী হয় সমাজের অন্য দুটি সম্প্রদায়, অর্থাৎ উচ্চবিত্ত। সমাজের প্রান্তবর্তী এই সকল মানুষ অনেক সময় সমাজের মূলস্রোতের বাইরেই অবস্থান করে। আর্থিক দৈন্যই তাঁদের অবস্থানগত নিরাপত্তাহীনতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচাটাই যেন তাঁদের জীবনের নিয়ম হিসেবে মান্য করে তাঁরা। কায়িক পরিশ্রমই তাঁদের জীবনের একমাত্র মূলধন। সমাজের এই সকল প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে বিশেষ ভাবে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই ভারতেরই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তাত্ত্বিক নারীবাদী অধ্যাপিকা বিশেষভাবে বিশ্বের দুনিয়ায় পরিচিত তাঁর 'ক্যান দ্য সাবঅলটার্ণ স্পীক'? প্রবন্ধের জন্য। এই সাবঅলটার্ণ বা প্রান্তিক জনজাতি কী আদৌ নিজেদের কথাটুকুও বলার অধিকার রাখে?—এটা একটা বড় প্রশ্ন।

গায়ত্রীদেবী নিজেই বলেছেন যে না তাঁরা বলতে পারে না। আসলে এই মানুষগুলোর জীবনে না পাওয়াটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তাই তো সমাজের মূল স্রোতে থাকা মানুষগুলি তাঁদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে।আর্থিক দৈন্য মানুষকে যে কতটা অসহায় করে তোলে তা এই ব্রাত্যজনদের দেখলেই বোঝা যায়। তাঁদের নিয়েই দরদী লেখকের ভূমিকায় গায়ত্রীদেবী ছাড়াও আমরা পেয়েছি মহাশ্বেতা দেবী, রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখকে। সমাজের অংশীদার হয়েও সমাজের ওধারে থাকা অবহেলিত এই সকল মানুষের কথা বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ফুটে উঠতে দেখেছি আমরা। কোনো কোনো সাহিত্যকার তাঁদের মানবপ্রীতির সমুজ্জল সাক্ষ্য রেখে গেছেন এহেন কিছু চরিত্র তথা তাঁদের

জীবনকথাকে স্থান দিয়ে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাছ ধরবার বৃত্তিগ্রহণকারী মানুষের জীবনচিত্র পাঠকের সামনে প্রকাশ করেছেন।

বাঙালির সঙ্গে মাছভাত কথাটা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা অনায়াসেই এই মাছভাত কথাটা উচ্চারণ করে ফেলি। কিন্তু ভাতের পাতে মাছ, বিশেষ করে বর্ষার সময় ইলিশ মাছ যোগাতে মাঝিদের যে কত জীবনযুদ্ধ তা অনেক সময়ই আমাদের জানা সম্ভবও হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিগুণে এই মাঝিদেরই জীবনকাহিনি তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটির গভীরে প্রবেশের পূর্বে স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে একটু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেকোনো লেখকের ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি সত্য যে তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর প্রভাব তাঁর নিজস্ব মনোজগৎ গড়ে তোলে। মানিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি প্রথম জীবনে ফ্রয়েড তারপর মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমানী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। প্রথম উপন্যাসদ্বয় 'জননী' ও 'দিবারাত্রি কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। আমাদের আলোচ্য 'পদ্মানদীর মাঝি' ঠিক এর পরের বছর প্রকাশ লাভ করে। ঐ একই বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ -এ তাঁর 'পতল নাচের ইতিকথা'ও প্রকাশিত। জীবনের এই সময় মানিক ছিলেন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী। মানবমনের সূক্ষস্তরের রূপকার হিসেবে এই সময় আমরা স্রষ্টা মানিককে পেয়ে থাকি। মানবজীবনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির সন্ধানে তিনি মনকেই দ্বায়িত্বশীল বলে মনে করেছেন। মানিক পরবর্তীতে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি প্রথামাফিক কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। ফ্রয়েডীয় মোহ কাটিয়ে ধীরে ধীরে সাম্যবাদী মানিক আত্মপ্রকাশ করেন। সাধারণ জনগণের সঙ্গে প্রকৃত একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন এই সময়ই তিনি। তাঁর মনোজগতের এওরূপ পরিবর্তনের ছাপ এই সময়কার রচনায় স্পষ্ট। যেমন উল্লেখ করা যায় 'দর্পন', 'প্রতিবিম্ব' প্রভৃতি রচনা। এরও পরবর্তীতে অর্থাৎ 'হারানের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' ইত্যাদি রচনায় তাঁর সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিণত রূপ আমরা পেয়ে থাকি। অনেকের মতে সাম্যবাদী চেতনায় ঋদ্ধ মানিকের লেখার মান পূর্বের তুলনায় পড়ে গিয়েছিল। আমরা সেই সকল বির্তকে না গিয়েই ফ্রয়েডীয় ভাবনায় ভাবিত মানিক সৃষ্ট 'পদ্মানদীর মাঝি'র নিবিড় পাঠে মনোনিবেশ করব। লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রসঙ্গে মানিক স্বয়ং যে মন্তব্যটি করেছিলেন সেটি একটু উল্লেখ করা যাক-

> 'নিজস্ব একটা জীবন দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য তাঁর শুধু বসে বসে লেখার বা প্রুফ সংশোধন করার শ্রম নয় --- সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমও তাঁকে চালাতে হবে'।[১]

মানিক এমন একটি সময়ের রূপকার যিনি পরাধীনতা থেকে দেশের স্বাধীনতা দেখেছেন। রাষ্ট্রিক থেকে সামাজিক নানা পালা-পরিবর্তন ঘটতে দেখেছেন। দেশ স্বাধীন হলেও বিভক্ত হয়ে গেছে। এই টানাপোড়েনের কালের স্রষ্টা মানিকের লেখায় তাই সম্পর্কের টানাপোড়েন যেন যুগ চাহিদা হিসেবেই এসেছে। মানবমনের রহস্য উদঘাটনে তাঁর অনুসন্ধিৎসা লক্ষনীয়। সমাজের সর্বস্তরের তিনি সাহিত্যপাত্রে ধরতে চেয়েছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিতে দেখা যায় সমাজের অনভিজাত নেহাত-ই খেটে খাওয়া জেলে মাঝির জীবনচর্যা। উপন্যাসটি পাঠকের আকর্ষণ তথা কৌতূহল জাগিয়ে তোলেও মূলত সেই কারণেই। পদ্মানদীর মাঝিদের নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে 'মাছধরা' নামক মহাযজ্ঞ সমাপন করবার দুঃসাহসিক বাস্তব কাহিনিই এখানে উপজীব্য। এখানে মূল চরিত্র কুবের। কুবেরের জীবনের সেই অ্যাডভেঞ্চার-ই পাঠককে মুগ্ধ বিস্ময়ে এই গ্রন্থের নিবিড় পাঠক হতে সাহায্য করে। কুবের বা তাঁর মতো জেলে-মাঝিরা যে সমাজের সত্যই প্রান্তজন তা উপন্যাসেই লেখক স্পষ্ট করেছেন। সেখানে দেখি জেলেপাড়া বলতে একটা ঘিঞ্জি বস্তি। তাঁদের কুঁড়েঘরে কোনো রকমে মাথা গোঁজাটুকুই হয়। যদিও সে ঘর ততটা নিরাপদ তথা নিরুপদ্রবও নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার তাঁদের বিশেষভাবে হতে হয়। কালবৈশাখীর প্রবল দাপট, বর্ষার জলের বেহিসেবি চাল, প্রবল শীতের থাবা কোনোটি থেকেই তাঁরা মুক্ত নয়। নানান অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তাঁদের জীবন কাটে লেখক তাই বলেছেন ---

> 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায় আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না'। [২]

আসলে সার্বিকভাবে বঞ্চনাই এদের জীবনের স্বাভাবিক প্রাপ্তি; তাই এদের কোনো চাহিদা নেই। অথবা নিজেদের অপ্রাপ্তিটাই তাঁদের প্রাপ্য বলে তাঁরা মনে করে। এমনকি সর্বশক্তিমান ও সর্বত্রাতা ঈশ্বরও তাঁদের জন্য অনুপস্থিত। ঈশ্বরও ভদ্রপল্লীর অধিবাসী, এই ভদ্রেতর পাড়ায় তিনি আসেন না। অর্থাৎ শুধুমাত্র সমাজের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের দ্বারা নয়, ঈশ্বরের দ্বারাও তাঁরা প্রান্তজনে পরিণত হয়। তাই ওদের সমাজের মূলস্রোতের ওধারেই জীবন নির্বাহ করতে হয়।
এই উপন্যাসের কাহিনি নিতান্তই ছোটো। কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। পদ্মাতীরবর্তী কীতুপুর গ্রামে তাঁর ঘর। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরে সে পরিবারকে রক্ষা করে। অনেক সময়ই পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য তো পায়ই না বরং বঞ্চনারই শিকার হয়। কুবেরের পঙ্গু স্ত্রী মালা।

একটি কন্যা ও দুটি পুত্র নিয়ে তাঁদের সংসার। কন্যা গোপী ও দুই ছেলে লখা ও চন্ডী। মালা আবার সন্তানসম্ভবা। কুবেরের একঘেয়ে জীবনে বর্ণময়তা বা বৈচিত্র্য আনে শ্যালিকা কপিলা। কেতুপুর গ্রামটি মেজকর্তার অধীন। তাঁর নাম অনন্ত তালুকদার। জেলেপাড়ায় যারা দু-এক বিঘা জমি রাখে তাঁরা মেজকর্তাকেই খাজনা দেয়। কুবের যে নৌকোটি নিয়ে মাছ ধরে সেটি ধনঞ্জয় এর। মাছ ধরবার জালটিও তাঁর। এই নৌকোয় আর একজন মাঝিও আছে –যার নাম গনেশ। ধনঞ্জয় জাল ও নৌকার মালিক বলে সে শুধু নৌকার হাল ধরে বসে থাকে। প্রতি রাতে যত মাছ ওঠে তাঁর অর্ধেক ভাগ তারই প্রাপ্য। বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশ পেয়ে থাকে। দারিদ্র্য, সীমাবদ্ধতা নিয়েও তাঁদের জীবন একরকম চলছিল। কিন্তু গ্রামে কিছুদিন যাবৎ এক রহস্যময় মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। যার নাম হোসেন মিয়া। তাঁর বাড়ি নোয়াখালি। তাঁর মধুর কৃত্রিম ব্যবহারে ও সাজে তাঁর অন্তর যেমন অনুভব করা যায় না, বয়সটাও ঠিক ধরা যায় না। তাঁর ছোটোখাটো তৈল চর্চিত দেহ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি তাঁর পরণে। বাড়ি তৈরি করে দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সচ্ছল সুখের সংসার। তাঁর সচ্ছলতা কোন পথে প্রাপ্ত তাঁর সন্ধান কেউ জানে না। তাঁর নেশা নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট দ্বীপে প্রজা বসিয়ে জমিদারী স্থাপন করা। আর এই নেশাকে বাস্তবায়িত করতে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলিকেই সে নির্বাচন করেছে। যাঁদের শ্রমের মূল্যে ঐ জঙ্গলাকীর্ণ বন্য পশুপাখিপূর্ণ জনমানবহীন স্থানটিকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে নেওয়া যাবে। বুভুক্ষ মানুষগুলিকে নানাভাবে লোভ দেখিয়ে এশা দিয়ে ঐ দ্বীপে পাচার করে দিতে উদ্যোগী হোসেন মিয়া। কুবের বা জেলেপাড়ার কেউই ঐ 'ময়নাদ্বীপে' যেতে চায় না; তাঁরা ভীতগ্রস্ত। হোসেন মিয়াও কারো প্রতি বল প্রয়োগ করে না। তবে অসহায় মানুষগুলির বিপদে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে তাঁদের স্বকৃত আটক করবার কৌশলটি সে রপ্ত করেছিল। কুবের তাঁর কাছে অর্থসাহায্য নিয়ে এবং তাঁর নৌকায় মাঝির কাজ নিয়ে তাঁর কাছে একরকম কেনাই হয়ে গিয়েছিল। তাই বিনা দোষে চুরির দায়ে জড়িয়ে পড়া ও জেলে যাওয়ার উপক্রম হলে কুবের যখন উদ্ভ্রান্ত, তখন মিয়ার এক কথাতেই কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে পাড়ি দেয় কুবের, তাঁর নতুন অধিবাসে সঙ্গিনী হয় শ্যালিকা কপিলা।

কাহিনিবস্তু হিসেবে তেমন কোনো বিশালত্ব এই উপন্যাসের নেই। কিন্তু এই সামান্য কাহিনিটিকেই মহাকাব্যিক দ্যোতনায় মূর্ত করে তুলেছেন মানিক। আর্থিক দীনতা মানুষকে কিভাবে বিভিন্ন নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার করে তোলেতারই কাহিনি এই পদ্মানদীর মাঝি। নিজেদের কারণে কায়িক শ্রমকেই মূলধন করে তাঁরা স্বাভাবিক বাঁচতে চায়। কিন্তু দুর্দৈবের মতো তাঁদের জীবনে হোসেন মিয়ার আবির্ভাব। জমিদারী পত্তনের বাসনায় মানসিকভাবে যেন সে উন্মাদগ্রস্ত। নিরীহ অসহায় মানুষগুলির সর্বনাশ সাধনে এতটুকু অনুশোচনা নেই। তাই মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপে এই হতদরিদ্র মানুষগুলিকে চালান করতে তাঁর ছলের অভাব হয় না। সমাজের এই সকল প্রান্তবর্তী মানুষ ঠিক যেন ততটা মানুষ নয় যতটা সম্পন্ন মানুষদের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে। তাঁদের দিয়ে অনায়াসেই তাই সম্পন্ন মানুষ ফরমাশ খাটিয়ে নিতে পারে। আবার নিজের কোনো একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছেকে পূরণ করতেও যেন এই সম্প্রদায়টিকে অনায়াসেই কাজে লাগানো যায়। রাসুর সপরিবার কেতুপুর গ্রাম থেকে ময়নাদ্বীপে স্থানান্তরিত হওয়ার কাহিনি পাঠককে স্তব্ধ করে দেয় মুহূর্তের জন্য। যেখানে দেখি খিদের তাড়নায় রাসু, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মিয়ার পরামর্শে ময়নাদ্বীপে যায়। সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করেছিল নিশ্চিত মৃত্যু। সেই মৃত্যু রাসুর স্ত্রী ও সন্তানদের গ্রাস করে। একমাত্র জীবিত রাসু কেতুপুর প্রত্যাবর্তন করে সেই স্থানের ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে যে- বাঘ সিংহ তো বটেই আরো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সেখানকার। একটু উদ্ধার করি ---

> '-কী নাই ময়নাদ্বীপে কও? সাপ যা আছে এক একটা আস্ত মাইনষের গিলা খায়! রাইতে সুমুন্দুরের কুমীর ডাঙায় উঠ্যা আইস্যা মাইনষেরে টাইনা নিয়া যায় –হ বলিতে বলিতে মুখ খুলিয়া যায় রাসুর, আর শুনিতে শুনিতে হাঁ হইয়া যায় তাহার শ্রোতাদের মুখগুলি। হোসেন মিয়ার মুয়নাদ্বীপ এমন ভীষণ স্থান সেটা?[3]

এমনকি নিজের স্বপ্ন ময়নাদ্বীপকে একটি জনপদে গঠন করতে মরিয়া হোসেন মিয়া ঐ অঞ্চলে যাঁদের চালান করে তাঁদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে নেয়। তাই রাসু ফিরে এলেও তাঁর যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে তাঁকে আর মনুষ্যবৎ মনে হয় না-

> ‘রাসুর মাথায় বড় বড় চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, কয়েকটি ঘা এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। দুটি পা-ই তাহার হাঁটুর কাছ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা। গায়ের চামড়া যেন তাহার আলগা হইয়া শুকাইয়া শক্ত ও কালো হইয়া উঠিয়াছিল, এখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজা জুতার চামড়ার মত স্যাঁৎসেঁতে দেখাইতেছে’.[৪]

একটি মানুষের এই পরিণতি আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে।

হোসেন মিয়া এখানে ধনতন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে এসেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত নিবেদিত জেলে সমাজে এই ধনতন্ত্রের আঘাত এসে লেগেছে। ধন ও শ্রমের উপরেই ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ধন মিয়ার রয়েছে কিন্তু শ্রম কিভাবে পাওয়া যাবে সেই হিসেবে টাও তার করায়ত্ত। কুবেরকেও চতুর বুদ্ধ বলে ময়নাদ্বীপে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে হোসেন মিয়া। ধনতন্ত্রই এখানে বিশেষভাবে সক্রিয়। কুবের তাই অসহায়ভাবেই এই তন্ত্রের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ কুবেরের কথাবার্তা আচরণে সেই সমাজেরই মূল্যবোধ দেখা যায়। যেমন্সত্রী মালা তাঁকে তাঁদের মেয়ে গোপীকে বিবাহ যুগল কতটা সম্মত সেই জানতে চাইলে বিরক্ত কুবের বলেছে ---‘তা শুইনা তোর কাম কী? মাইয়া লোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের

> “তা শুইনা তোর কাম কী? মাইয়া লোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইয়া পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস – রাও করস কেন রে’?[৫]

অর্থাৎ নারীর শুধুমাত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া ভিন্ন সমাজে আর কোনও ভূমিকা নেই। তাঁদের ব্যক্তিমর্যাদা ঐ সমাজব্যবস্থায় স্বীকৃত ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় নারীকে বিশেষভাবে পর্দানসিন করে তাঁর সন্তানটির পিতৃপরিচয়ের সুনিশ্চয়তাদানের প্রবণতাটিও দেখা দিয়েছিল। এও সামন্ততন্ত্রেরই চক্রান্ত। উপন্যাসে আমরা দেখি নারী যে পুরুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র। আবার লালসা মিটে গেলেই অন্য নারীতে আসক্তি যেন ঐ সমাজ স্বকৃত। তাই তো কুবের অসহায় স্ত্রী মালাকে গর্ভবতী অবস্থাতেও অনায়াসে অবহেলা করে শ্যালিকা কপিলার প্রতি প্রেমানুভূতিতে আনন্দলাভ করেছে।

এই উপন্যাসে সমাজের প্রান্তজনের জীবনকথা বর্ণিত তা আমরা দেখলাম। তবে মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী মানিক এখানে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন। কুবেরের মেয়ে গোপীর আঘাতের কারণে তাঁকে মহকুমা শহর আমিনবাড়ির সরকারী হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তাঁর পর ঘটনাক্রমে মেয়েকে পরের দিন আবার দেখতে আসা অতদূর থেকে (ঘণ্টা তিনেকের পথ)। অসুবিধা বিবাচনা করে তাঁরা দুজনেই একটা হোটেলে রাত কাটাতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় কপিলার প্রথম থেকেই দেখা যায় আগ্রহ অধিক ছিল।

পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে এ নিয়ে কিছুটা লজ্জাবোধ কাজ করেছে। কিন্তু কুবেরের মধ্যে দেখা যায় প্রথমাবধি মানসিক অস্থিরতা। তাঁর মধ্যে পাপবোধ কাজ করে। এই পাপবোধ ঐ অন্ত্যজ সমাজের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক নয় বরং কিছুটা আরোপিত। এখানেই তাঁর মধ্যে মধ্যবিত্তের মানসিকতা ফুটে উঠেছে। এই সূত্রে বলা যায় উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার ধর্ম কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ তাঁদের মন ও জীবনকে তিনি নিখুঁতভাবে আঁকতে সক্ষম হননি।

এইটুকু বাদ দিলে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ দরিদ্র – অসহায় – নিস্তরঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত জেলে মাঝিদের প্রায় জীবন্তচিত্র। বিশেষত পূর্ব্বঙ্গীয় মধুর উপভাষা সহযোগে পরিবেশিত হওয়ায় তা অধিকতর বাস্তবসম্মত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

> “আঁতুড় হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়েছে? ছনগুলো লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান। মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি প্রায় শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাঁর পরিবর্তে সে বিরক্ত হইয়াই বলিল, কিয়ের সমান! ছন না পাইতা ভিজা

ভিতে শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা থাক। চালার লাইগা ছন লাগে আইনা লমু। হোসেন মিয়া না কইছিল খড় দিব”?[৬]

পাঠকের কৌতূহলী আকর্ষণও তৈরী করেছে ঐ সকল প্রান্তজনের জীবনের দুঃসাহসিক সংগ্রামের চিত্র। এই চিত্র আমাদের বড় বেশি পরিচিত নয়। বরং বলা যায় ওরা আমাদের কাছের কেউ নয় ওরা থাকে ওধারে। একথা বলার কৈফিয়ৎটুকু দেওয়া প্রয়োজন মনে করি আসলে পদ্মান্দীর মাঝি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র। তাঁরা জেলে মাঝি। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কাহিনিতে মূলত কুবের ও তাঁর পরিবারের চিত্রই কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। কুবের, তাঁর স্ত্রী মালা, শ্যালিকা কপিলা ও তাঁদের একাধিক সন্তান। তবে তাঁদের ঘিরে রেখেছে আরো কিছু চরিত্র। পদ্মানদীর মাঝিদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন এবং সেই জীবনের ভাঙন - উপনিবেশ গঠনের এক ট্র্যাজিক পরিণতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মাঝিদের নিত্যদিনের জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য-হতাশা যে চেতনা জাগিয়েছিল তা থেকে পরিবর্তনের চেষ্টা কুবের তথা অন্য জেলেরাও করতে চেয়েছিল - সেখানে হোসেন মিয়া একটি নতুন মানসিক গঠন নিয়ে উপস্থিত হয়। তাঁর উপনিবেশ গঠনের অবিচল ভাবনা এই হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলির জীবনকে চরম সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে। তাঁরা পরিণত হয়েছে সর্বহারায়। সমাজের মূলস্রোতের ওধারে থাকা মাঝি সম্প্রদায়ের স্বপ্নভঙ্গের এক ওইতিহাসিক ট্র্যাজেডি এই উপন্যাস। আসলে কুবেরদের যাত্রা এক উপনিবেশ থেকে আর এক উপনিবেশে। জেলেদের চেতনার জগতে প্রথম উপনিবেশ অসহায় নিরুপায়ত্বর জন্ম দিয়েছিল যা স্থবির হয়ে পড়েছিল, হোসেন মিয়ার উপনিবেশ তাঁর থেকে সচল হলেও তা অতি ভয়ঙ্কর। বন্যশ্বাপদে ভরা। যদিও হোসেন মিয়া চৈতন্যের অসংলগ্নতায়, বদ্ধতায় জেলেপাড়ারই একজন; কিন্তু সে অর্থবানদের সঙ্গে মেশে না। তাঁর লক্ষ্য নীলামে জমি কিনে উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। যে সাম্রাজ্য থাকবে না কোনও জাতিগত ভেদাভেদ। আবার সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমও স্থানে প্রশ্রয় পাবে। তাই কুবের ও কপিলা পাড়ি দেয় সেই সর্পসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ ময়নাদ্বীপে। আসলে তাঁরা এক অন্ধকার থেকে ঘোরতর অন্ধকারের দিকে যায়। হোসেন মিয়া মানুষগুলির সীমাহীন দারিদ্র্যজনিত দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। রিক্ত নিঃস্ব মানুষগুলির সর্বহারা হওয়ার পথ প্রশস্ত করে। এই নিদারুণ ট্র্যাজেডিই উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য - যা প্রকাশে স্রষ্টা যথার্থই সফল। কাহিনিটি পদ্মানদীর জেলে মাঝি বা ওই বিশেষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য। যা পাঠকেরও বিশেষ করুণার উদ্রেক ঘটায়।

সূত্রঃ-

১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দেজ পাবলিশিং। কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৬।
২. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল - ৭৩, জৈষ্ঠ্য ১৪০৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা -২৪।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৩।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৫।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক - সেরা মানিক, সৃষ্ঠি প্রকাশালয়, ৬/বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কল-৯, ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫৬